Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০২৬ সংখ্যা ৩০

নতুন সরকারের সূচনাবিন্দু
একটি অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

প্রেক্ষাপট

দেশ একটি উত্তরণকালীন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল এ সময়কালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, সরকারের ওপর নির্বাচনী ইশতেহার প্রসূত রাজনৈতিক ও নাগরিক প্রত্যাশাও অনেক বেশি। আগামী দিনে দেশের অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে সূচনাবিন্দু সঠিকভাবে সরকারের দিক থেকে অর্থনীতির ভিত্তিভূমি সংজ্ঞায়িত করা এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ভিত্তিভূমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে সরকারের পক্ষে চলমান অর্থবছরের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭ প্রণয়ন এবং মধ্য-মেয়াদী আর্থিক কাঠামো প্রস্তুত করা সহজতর হবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন

অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান: সামষ্টিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা; বিনিয়োগে স্থবিরতা; ও দূর্বল কর্মসংস্থান পরিস্থিতি। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সরকারের যে আর্থিক সংগতি ও সক্ষমতা প্রয়োজন তাও বেশ নাজুক অবস্থায় আছে। মূল্যস্ফীতি বিগত বেশ কিছু বছর বেশ উচ্চপর্যায়ে রয়েছে। ২০২৬ সালে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও মূল্যস্তরও বেশ উঁচুতে অবস্থান করছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭ শতাংশ। যার মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির অবদানই বেশি। খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। বছর খানেকের বেশি ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক



সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বা সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে তা খুব বেশি কার্যকর হচ্ছে না।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে একটি ভালো জায়গায় পৌঁছেছিল। একই সাথে বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক খাতের স্থিতিশীলতার পেছনে অবদান রেখেছিল নিয়ন্ত্রিত আমদানি এবং উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ। আগের অর্থবছরের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ২ বিলিয়ন ডলার আমদানি হ্রাস পেয়েছিল। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি কমে যাওয়া এবং আমদানি বেড়ে যাওয়ার পরও অব্যাহত উচ্চ রেমিট্যান্স এবং ঋণাত্মক বাণিজ্যিক ঋণ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দুই অর্থবছরেই সবচেয়ে স্বস্তির জায়গা ছিল রেমিট্যান্স, আর দুর্বলতার জায়গা ছিল নিট বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের (Balance of Payments) ওপর চাপ আপাতত হ্রাস করা সম্ভব হলেও আগামীতে এই চাপ ধীরে ধীরে বাড়তে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয় এবং ব্যাংক খাত থেকে নেয়া সরকারি ঋণ, এই দু'টি উৎসই মূলত দেশে মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বেসরকারি খাতের ঋণের প্রভাব এ ক্ষেত্রে ছিল সীমিত। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসের মূল কারণ হলো শিল্প ও সেবা খাতের ঋণ প্রবাহ কমে আসা। এ প্রবণতা বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে স্থবিরতার ইঙ্গিত দেয়। ২০২৪ সালের পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের ওপর জরীপভিত্তিক কোনো তথ্য নেই। ২০২৪ সালের শেষ ছয় মাসে কর্মসংস্থান বড় আকারে হ্রাস পাওয়ার তথ্য রয়েছে। পরবর্তী সময়ের জন্য হালনাগাদ তথ্য না থাকলেও কারখানা বন্ধ হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে কর্মসংস্থান চাপে থাকার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অর্থায়নের আগে সরকারের অন্যান্য যেসব দায় থাকে, তার পর্যালোচনা প্রয়োজনীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের এ ধরনের পরিচালন ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের তুলনায় রাজস্ব আয় ৫ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা কম ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬০ হাজার ২৯৪ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পুরোনো ঋণ পরিশোধের জন্যই মূলত নতুন করে ঋণ নিতে হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে কেবল চলতি ব্যয় মেটাতেই গত অর্থবছরে ২৩ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা ঋণ করতে হয়েছে। সর্বশেষ আশির দশকে এমন পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল এবং সে সময় বাধ্য হয়ে এডিপির বরাদ্দ ও ব্যয়ে হ্রাস টানতে হয়েছিল।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে ঘাটতি ছিল প্রায় এক লাখ কোটি টাকা, যে সংখ্যা চলতি অর্থবছরে ছাড়িয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দেশি-বিদেশি ঋণের চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। ২০২৪ সালের জুনের তুলনায় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ সরকারের সার্বিক ঋণ বেড়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই বাড়তি ঋণে অভ্যন্তরীণ ঋণের অবদান ৪৬ শতাংশ, অবমুক্ত বিদেশি ঋণ ৪২ শতাংশ এবং মুদ্রা অবমূল্যায়নজনিত অংশ ১২ শতাংশ।

সরকারের ১০টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন

জিডিপি ১ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা: বিএনপি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ২০৩৪ সালের মধ্যে অর্থনীতির আকার এক ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার কথা বলেছে। এর জন্য গড়ে ৯ শতাংশ হারে (নমিনাল ও ডলার মূল্যে) জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনে স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি বজায় রেখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে টানা ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। পুরো সময়কালে বার্ষিক প্রায় ৩ শতাংশ হারে টাকার অবনমন

অনুমান করা হয়েছে। এই দৃশ্যপটে বর্তমান সরকারের শেষ অর্থবছরে (২০৩০-৩১) জিডিপির আকার ৭৭৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে নেওয়া: নির্বাচনী ইশতেহারে ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৬.৮ শতাংশ এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ৮.৩ শতাংশ। যদি সরলরৈখিক অগ্রগতি ধরা হয়, তাহলে ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করতে প্রতি বছর প্রায় ০.৯ শতাংশ হারে এ হার বৃদ্ধি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ২০৩১ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১১.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সংস্কারনির্ভর যে কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে স্বল্পমেয়াদে অতিরিক্ত ২ শতাংশ কর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এ কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ২০৩১ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৩.৩ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। রাজস্ব খাতে ব্যাপক সংস্কার ও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী বলে প্রতীয়মান হয়।

বৈদেশিক বিনিয়োগ জিডিপির ২.৫ শতাংশে উন্নীত করা: এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ১.৭ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির মাত্র ০.৪ শতাংশের সমান। ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে যদি এই লক্ষ্য অর্জন করতে হয় তাহলে নিট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৯.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হবে। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রায় ৫০ শতাংশ হারে। এই লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করবে বড় আকারের বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপর। গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মতো খাতে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা, সর্বনিম্ন ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং আমদানিনির্ভরতা হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৭,৯০৪ মেগাওয়াট। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৭,১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা প্রয়োজন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সাথে বিদ্যুৎ খাতে গ্যাস সরবরাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে হবে। দেশে ব্যবহৃত মোট গ্যাসের প্রায় ৬০ শতাংশই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হলে স্বল্পমেয়াদে আমদানির ওপর নির্ভরতা এড়ানো কঠিন হতে পারে। এ কারণে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম দ্রুততর করা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়লেও পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহের অভাবে সেই সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা কঠিন হবে।

অবসায়িত ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া: সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি ইসলামী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা, যা ২০২৫ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৩৩ শতাংশের সমান। ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য এই আমানতের একটি বড় অংশ করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করে ফেরত দিতে হতে পারে। যদি আগামী পাঁচ বছরে কর রাজস্ব থেকে ১ লাখ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়, তাহলে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা এ জন্য বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। যদি এই সহায়তা প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সরকারের আর্থিক বোঝা তুলনামূলকভাবে কম হবে। আরও বেশ কয়েকটি ব্যাংক বর্তমানে সংকটে রয়েছে এবং তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য এবং তা আদায় করা কঠিন হতে পারে। ফলে এসব ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সরকারি সহায়তা প্রদানের দাবি বা প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে সরকারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে ব্যাংক খাত পুনর্গঠন এবং

আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা শুধু আর্থিক খাতের নয়, বরং সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও বাজেট সক্ষমতার জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

৫০ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান: প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ পরিবারকে প্রতি মাসে ২,০০০-২,৫০০ টাকা সহায়তাসহ এ কর্মসূচির আওতায় আনতে বছরে প্রায় ৯,৬০০ থেকে ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এ উদ্যোগ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে এটি সর্বজনীন নূন্যতম আয় বাস্তবায়নের একটি সম্ভাব্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তাদের নাগরিক *ইশতেহার-এ* এমন একটি ধারণা প্রস্তাব করেছিল। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজস্ব ও বাজেট-জনিত সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন। প্রচলিত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সুবিধাভোগী নির্ধারণ করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে 'প্রক্সি মিন্‌স টেস্ট' পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেখানে পরিবারের বিভিন্ন আর্থসামাজিক সূচকের ভিত্তিতে তাদের অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ২০২৪ সালের এক গবেষণার ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে 'দারিদ্র্য স্কোরকার্ড পদ্ধতি' প্রস্তাব করেছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ: ইশতেহারে কোনো সুস্পষ্ট সময়সীমা উল্লেখ না করা হলেও ধারণা করা যেতে পারে সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। বর্তমানে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় খুবই কম। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে প্রকৃত ব্যয় ছিল জিডিপির মাত্র ০.৩ শতাংশ, যদিও বরাদ্দ ছিল জিডিপির ০.৭ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.৭ শতাংশে রাখা হয়েছে। সুশাসন ও ব্যয় দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপির ১ শতাংশে উন্নীত করা যেতে পারে। পরবর্তী চার বছরে প্রতি বছর গড়ে ১ শতাংশ পয়েন্ট করে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপির ৫ শতাংশে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য কর রাজস্ব ও অন্যান্য দেশীয় উৎস থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতাল, মানবসম্পদ, ওষুধ, জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি ইত্যাদি উপখাতে অর্থ বণ্টনের একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। শুধু বরাদ্দ বাড়ানো যথেষ্ট হবে না। অর্থের কার্যকর ব্যবহার, অপচয় রোধ, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ: ইশতেহারে উল্লেখ না থাকলেও ২০৩১ সাল অর্থাৎ সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা বলে ধারণা করা যেতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশ। শিক্ষা খাতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বরাদ্দকৃত অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতার অভাব। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে প্রকৃত ব্যয় ছিল জিডিপির ১.৫ শতাংশ, যদিও বরাদ্দ ছিল ২ শতাংশ। যদি সরলরৈখিক প্রবৃদ্ধির পথ অনুসরণ করা হয়, তাহলে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতি বছর ০.৬ শতাংশ পয়েন্ট হারে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিকল্প হিসাবে একটি ত্বরান্বিত কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শুরুতে সীমিত হারে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি ক্রয়প্রক্রিয়া, জনবল ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেট জিডিপির ২.৩ শতাংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে। পরবর্তী বছরগুলোতে বছরে গড়ে ০.৭ শতাংশ হারে বাড়ালে ২০৩১ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতের অবদান জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হতে পারে।

'এক শিক্ষক, এক ট্যাব' কর্মসূচি: প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষককে ট্যাব সরবরাহ করতে হলে ৫২০ থেকে ৭৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য একই

উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত ২৩০ থেকে ৩৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। তবে ট্যাব বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষাদান কার্যক্রমে ট্যাবের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এই প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অতীতের 'ডিজিটাল ক্লাসরুম' উদ্যোগের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। শিক্ষা খাতের মৌলিক চাহিদা, যেমন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের শেখার ফলাফল উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোতে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।



নীতি সুপারিশ

- **নীতি সুদহারের যৌক্তিকরণ:** খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ওপর নীতি সুদহার বৃদ্ধির কার্যকারিতা সীমিতনীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতে হবে। এতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি ইতিবাচক সংকেত পৌঁছাবে। সুদহার হ্রাসের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও ডলার ব্যবস্থাপনা:** বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে আছে এবং ফলশ্রুতিতে আইএমএফের শর্ত পূরণ হয়েছে। বাজারে মুদ্রার অতিরিক্ত সরবরাহ ও তারল্য সংকট রোধ করতে আগামী চার মাস বাজার থেকে সরাসরি ডলার কেনা স্থগিত রাখতে হবে। ভাল রিজার্ভ টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রেখে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত রাখবে।
- **টাকার বিনিময় হার বাজারমুখী করা:** বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যমান বাজারভিত্তিক রাখা উচিত। যদি টাকার মানের অবমূল্যায়ন হয় তবে তা বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার নীতি বজায় রাখা উচিত। এর ফলে রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক গতিশীলতা তৈরি হবে।
- **নগদ প্রণোদনা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার:** রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাতের ওপর বিদ্যমান নগদ প্রণোদনা চলতি এবং আগামী অর্থবছরে সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া প্রয়োজন। এটি সরকারের বাজেট বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যয়ের চাপ কিছুটা হ্রাস করবে।

- **সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা:** অপচয় রোধে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে ও তা অনুসরণ করে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। আর্থিক সংকটে থাকা বা দেউলিয়া ব্যাংকগুলোকে সরকারি তহবিল থেকে নতুন করে কোনো সহায়তা-বরাদ্দ বা বেলআউট করা যাবে না। একই সাথে, বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
- **করের হার না বাড়িয়ে করজাল ও কর-মান্যতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদান:** নাগরিকদের ওপর করের হার না বাড়িয়ে কর কমপ্লায়েন্স বা কর-মান্যতার ওপর জোর দিতে হবে। প্রশাসনিক সংস্কার ও সুশাসনের মাধ্যমে করজাল সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাস করার ক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধির কার্যক্রম হবে অন্যতম কৌশল।
- **রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অবমুক্তকরণ:** সরকারের আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারে আস্থা ফেরাতে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার জরুরি ভিত্তিতে পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা উচিত। লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
- **পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধার ও খেলাপি ঋণ আদায়:** বিদেশে পাচার হওয়া বা চুরি হওয়া সম্পদ উদ্ধার এবং ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনি, কারিগরি এবং প্রয়োজনে কূটনৈতিক তৎপরতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করবে, অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উন্নত করবে ও আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করবে।
- **বাস্তবসম্মত সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন:** বিগত বছরগুলোর অবাস্তব প্রাক্কলনের ধারা থেকে বের হয়ে দেশের প্রকৃত ঋণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য একটি বাস্তবসম্মত সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা জরুরি। এটি মধ্যমেয়াদি আর্থিক কাঠামো (মিড-টার্ম ফাইনান্সিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক) ও আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।
- **নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন:** নতুন সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো একবারে বাস্তবায়ন করতে গেলে অর্থনীতির ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হবে। তাই আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত ব্যয় পরিহার করে গুণগত মান নিশ্চিত সাপেক্ষে প্রতিশ্রুতিগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা উচিত।
- **উত্তরণকালীন টিম গঠন:** বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রি পরিষদের মধ্যে থেকে একটা উত্তরণকালীন টিম গঠন করা যেতে পারে। এই টিম গত সরকারের রেখে যাওয়া পরিস্থিতিকে স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করে একটি পথরেখা প্রস্তুত করবে। এই টিম গত সরকারের আমলে সংগঠিত দুর্নীতি তদন্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংগৃহীত তথ্য জানাবে, যার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি ব্রিফিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। বিশেষত, সরকারের দায়দেনা, সরকারের ক্রয় ও বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা, তার ওপর একটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ২০০৯ সালে প্রণীত সরকারি আয়-ব্যয় ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইনের মাধ্যমে সরকার এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে পারে, যা আগামী দিনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
- **আর্থিক স্বচ্ছতা ও দায়দেনা পর্যালোচনা:** বিগত সরকারের রেখে যাওয়া প্রকৃত আর্থিক চিত্র, বকেয়া দায়দেনা এবং মেগা প্রকল্পগুলোর অনিয়ম মূল্যায়নে একটি উত্তরণকালীন কমিটি (ট্রানজিশানাল কমিটি) গঠন করা যেতে পারে। সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কমিটি সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বৈদেশিক চুক্তির শর্তাবলি পর্যালোচনা করে বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর আলোকে একটি 'ব্লু বুক' প্রকাশ করবে, যা আগামীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় একটি দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

মিডিয়া ব্রিফিং সম্পর্কে

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে 'নতুন সরকারের সূচনাবিন্দুঃ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' শীর্ষক একটি মিডিয়া ব্রিফিং আয়োজন করে। ১৩ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)-এর পরে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মিডিয়া ব্রিফিংটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত আলোচক

প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান

কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান

অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রেজেন্টেশন লিংক: https://tinyurl.com/k2ekhbaj

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের নীতি সম্পর্কিত অনুরূপ প্রকাশনাগুলো
নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ব্রিফিং নোট (১-৫১) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

লিংক: https://tinyurl.com/2s475p28

সিরিজ সম্পাদনায়: **অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান**
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও
সম্মাননীয় ফেলে, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ব্রিফটি প্রস্তুত করেছেন
জাকির হোসেন, সহযোগী সম্পাদক, সমকাল ও
নাহিয়ান রায়হানা প্রাপ্তি, সংলাপ সহযোগী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ: বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬ সালের জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ১৫০টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

সহযোগিতায়

UNDP

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২৬

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net